TJ BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION
অফিস : পরাণপুর, রতুয়া, মালদা
পরিষেবা :
ফ্লোর প্ল্যান | 3D ডিজাইন | স্ট্রাকচারাল | আর্কিটেকচারাল | ইন্টেরিয়র | ইস্টিমেশন | সয়েল টেস্ট | সার্ভে | অনুমোদন | সাইট সুপারভিশন
আপনার স্বপ্নের বাড়ি গড়ার বিশ্বস্ত সঙ্গী!
মোবাইল: 9591 475600

ই-জার্নাল
গবেষণাধর্মী পত্রিকা
সাহিত্যসেনা

ই-জার্নাল
সাহিত্যসেনা
আবার নতুন রূপে নতুন পথে নতুন ভাবনায় ফিরে এসেছে । লেখা পাঠান টাইপ করে Mail ID তে।
Mail : sahityasena@gmail.com,
Whatsapp : 8617377896

Volume No : 01 Issue No : 01, Sahityasena Journal, February : 2026

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য জীবন : সমকালীন নারী-সমাজ

ফারজিনা পারভীন

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরু -- এই ক্ষয়ে যাওয়া সমাজে আবির্ভূত হলেন বাঙলার অগ্নিকন্যা ও নারীজাগরণের প্রথম অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বেগম রোকেয়ার মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পায়। এই দুই মনীষীর বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় গড়েছেন। কলমের ডগা দিয়ে ঝরেছে নারীবাদী সাহিত্যের ফোয়ারা। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্টতই বলেছেন, -- 'মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও, তারপর তারাই তাদের সংগ্রামের পথ বেছে নিবে।' এই বাণীটিও বোধ করি বেগম রোকেয়ার জীবনে সমাজ সংস্কারের কাজে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলো। তাই রোকেয়ার সাহিত্য-জীবন পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তিনি কতটা সংগ্রামী মুখী ছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও গোঁড়া মানুষদের হাত থেকে মহিলাদের কীভাবে মুক্তির রসদ জুগিয়ে ছিলেন -- এইসবের দলিল তাঁর সাহিত্য লেখনী।

বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন জন্মগ্রহণ করেন ৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ খিস্টাব্দে, বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। পিতা- জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলি সাবের, মাতা-রাহাতুন্নেশা সাবের চৌধুরী। তাঁর দুই ভাই খলিলুর রহমান আবু জায়গাম সাবের ও আবোল আসাদ মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাবের। এবং বোন করিমুন্নেশা ও হুমাইরা। রাহাতুন্নেশার চতুর্থ সন্তানের নাম বেগম রোকেয়া। ছোটবেলায় তাঁকে রুকু বলে ডাকতেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে দিনের পর দিন নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠা।

বেগম রোকেয়ার পিতা ছিলেন স্ত্রী শিক্ষার চরম বিরোধী। তাই শৈশবে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাননি। পাঁচ বছর বয়সে তিনি মায়ের সঙ্গে কলকাতা আসেন এবং বড়ো বোনের শ্বশুর বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন মেম শিক্ষিকা রাখা হয়। কিন্তু তাঁর কাছে বেশিদিন শিক্ষালাভের সুযোগ হয়নি বেগম রোকেয়ার। কারণ প্রতিবেশীরা সমালোচনা করতে শুরু করে, ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে শিক্ষা নিলে পর্দা, জাতপাত, ধর্ম কিছুই থাকবে না। তাই বাধ্য হয়ে সেখান থেকে সরে আসতে হলো। কিন্তু হাল ছাড়লেন না তিনি। ভাই ইব্রাহিমের কাছ থেকে ইংরেজি শিখতে শুরু করলেন। পাশাপাশি দেশ বিদেশের গল্প কাহিনী শুনিয়ে তাঁকে শিক্ষানুরাগী করে তুললেন। ষোলো বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয় আটত্রিশ বছরের বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। একদিন দাদা ইব্রাহিমের কাছে যে শিক্ষা শুরু করেছিলেন তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে স্বামীর সান্নিধ্য পেয়ে।

ষোলো বছর বয়সে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় অবাঙালি পাত্র সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। তাঁদের বয়সের তারতম্য অনেক থাকলেও দাম্পত্য জীবন ছিল খুব মধুর। তিনি সংসারে কাজ করতে খুব ভালোবাসতেন। মাঝে মাঝে স্বামীর বন্ধুরা বাড়ি এলে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতেন। স্বামী রোকেয়াকে একটি সৌখিন ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন আর সেই ঘরে বসে রোকেয়া নিপুনতার সঙ্গে কাজ করতেন। লক্ষণ কর্মকার তাঁর "রোকেয়ার স্বদেশ ভাবনা '' প্রবন্ধে রোকেয়া সম্পর্কে বলেছেন, --

' বন্দী জীবনের অভিজ্ঞতার বেদনা তাঁর গভীর। কিন্তু দেশের অন্য মানুষ, অন্য জীবনকে দেখারও সুযোগ ঘিরেছিল রোকেয়ার জীবনে'

এই সুযোগ প্রতিফলিত হয় বিয়ের পর। বিয়ের পর রোকেয়া স্বামীর সঙ্গে নানা জায়গায় বেড়িয়েছেন। দেখেছেন মানুষের দুর্দশা। বিশেষ করে মহিলাদের করুণ দৃশ্য দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদেছে বারবার। আর এখান থেকেই শুরু হয় সমাজ সংস্কারের কাজ। একটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্বামীকে বলেন। স্বামী তাতে সাঁই দেন। সাখাওয়াত হোসেন সবভাবে সাহায্য করেন স্কুল তৈরির জন্য। ১৯০৯ সালে সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যু বরণ করেন। রোকেয়ার জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। তবু হাল ছাড়ার পাত্রী নন রোকেয়া। স্বামী মারা যাওয়ার পাঁচ মাস পর তিনি " সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল " নামে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ভাগলপুরে। ১৯১০ সালে সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার ফলে স্কুল বন্ধ করে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে ১৯১১ সালের ১৫ মার্চ রোকেয়া আবার " সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল " নির্মাণ করেন। প্রাথমিক অবস্থায় ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল আট জন। চার বছরের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় চুরাশিতে। ১৯৩০ সালের মাঝে এই স্কুল হাই স্কুলে পরিণত হয়। স্কুল পরিচালনা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি জীবনের সে

সেদিন পর্যন্ত রোকেয়া নিজেকে সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে ব্যস্ত রাখেন। ১৯১৬ সালে তিনি মুসলিম বাঙালি নারীদের সংগঠন ″ আঞ্জু মানে খাওয়াতিনে ইসলাম ″ প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সভায় তাঁর অন্তরের কথা তুলে ধরেন। ১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাঙলার নারীশিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সম্পর্কে ″ বঙ্গের মহিলা কবি ″ গ্রন্থে লিখেছেন, --

' বঙ্গের মহিলা কবিদের মধ্যে মিশেস আর. এস. হোসায়েনের নাম স্বরণীয়। বাঙ্গালা দেশের মুসলমান নারী প্রগতির ইতিহাস -- লেখক এই নামটিকে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। রোকেয়ার জ্ঞানপিপাসা ছিল অসীম।

আর এই জ্ঞানপিপাসা থেকে শুরু হয় রোকেয়ার সাহিত্য চর্চা। সমাজ সংস্কাকারের কাজ করতে গিয়ে গোঁড়া মুসলিমদের দ্বারা বারবার হেনস্থা হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু এই প্রতিবাদী মহিলা মাথা নত করেননি কোনোদিন কারো কাছে। একবার স্বামী সাখাওয়াত হোসেন অফিসের কাজে বাইরে গেছেন। একাকিত্ববোধ করছিলেন রোকেয়া। হঠাৎ এক টুকরো কাগজ নিয়ে লিখতে বসলেন। লিখে ফেললেন ″ Sultana's Dream″। একে বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যের মাইল ফলক বলা যেতে পারে। ″Sultana's Dream ″ প্রকাশিত হয় মাদ্রাজের ″ The Indian Ladies Magazine ″ এ। পরে তিনি নিজেই বাঙলাই অনুবাদ করেন ″ সুলতানার স্বপ্ন ″ নামে এবং এই রচনাটি ১৯২১ সালে ″ মতিচুর ″ বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডে স্থান পায়। এই রচনায় তিনি স্পষ্টতই লেখেন মেয়েদের প্রতি ছেলেদের অবিচার, ছেলেদের প্রভূত্ব থেকে মুক্তির নানা উপায়। শুধু তাই নয়, রোকেয়া পুরুষ সমাজকে উপহাস করতে ভুলেননি। তিনি বলেছেন, পুরুষরা করবে সংসারের কাজ আর মেয়েরা থাকবে অফিসে, প্রশাসনিক কাজে অর্থাৎ মেয়েরা বাড়ির বাইরের কাজ করবে।

″ সুলতানার স্বপ্ন″ তে রোকেয়ার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিরও পরিচয় পাওয়া যায়। আজ সরকার আইন প্রণয়ন করে, বিভিন্ন প্রকল্প চালু করে সুকৌশলে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার নানা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ বাল্যবিবাহ অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু প্রায় একশো বছর আগে ″ সুলতানার স্বপ্ন ″ তে বাল্যবিবাহ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন রোকেয়া, --

' একুশ বছর বয়সের আগে কোনো মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। এটা আইন হওয়া উচিত।'

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বেগম রোকেয়ার ″ মতিচুর ″ গ্রন্থটির প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মোট সাতটি প্রবন্ধ আছে। তারমধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো ″ সুগৃহিনা ″। সত্যিকারের একটি আদর্শ সংসার পরিচালনার জন্য একজন মহিলার সুগৃহিনী হওয়া প্রয়োজন। আজও সেকথা সমানে প্রযোজ্য। ″ সুগৃহিনী ″ প্রবন্ধে তিনি বলেন, --

'..... বীরাঙ্গনায় বীর জননী হয়। মাতা ইচ্ছা করিলে হৃদয়ের বৃত্তিগুলি স্বযত্নে রক্ষা করিয়া তাকে তেজস্বি, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারে...। অতএব সন্তান পালনের নিমিত্ত বিদ্যাবুদ্ধি চায়, যেহেতু মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষয়ত্রী।'

আর এরপরেই রোকেয়া লিখলেন ″ শিশুপালন ″ নামে একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পরে ″ মতিচুর ″ গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে স্থান পায়। ১৯২০ সালের ৬ এপ্রিল কলকাতা টাউন হলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে তিনি প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

'... আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষার জন্য দুটি বিষয় দরকারি হয়ে পড়েছে দেখেছি। প্রথম স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রচার, দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ রোহিত করা। ... শিশু রক্ষা করতে হলে আগে শিশুর মা'দের রক্ষা করা দরকার। ... মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ হয় বলে বেচারিদের শুকিয়ে মারবেন না। তারাই হচ্ছে ভবিষ্যত গৃহের গৃহিনী, তারাই হচ্ছে ভবিষ্যত বংশধরের জননী।'

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ছিল দেশের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। দেশের পরাধীনতার গ্লানি দেখে তাঁর প্রাণ বারবার কেঁদেছে। তিনি এও উপলব্ধি করেছেন দেশের স্বাধীনতা লাভ করতে হলে মেয়েদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। 'কিন্তু সে গুড়ে বালি। ' ধর্মের দোহাই দিয়ে মহিলাদের আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল ঘরের মধ্যে। তিনি সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন সমানভাবে। তবে ধর্মটাকে তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতেন। তাই পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে সমস্ত মেয়েদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করেন। এই কথা গুলি সুকৌশলে রূপকের আড়ালে ব্যক্ত করলেন তাঁর ″ মুক্তি ফল' ' রচনাতে।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর ″অবরোধ বাসিনী ″ রচনাটি। অনেকেই মনে করেন এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। শুধু মুসলিম সমাজের মহিলাদের কথা নয়, সব ধর্মের মহিলাদের পরাধীনতা, অসহায়তার কথা ব্যক্ত করেছেন এই রচনাতে। তৎকালে মেয়েদের ধর্মের অজুহাত দেখিয়ে ব্যবহার করা হত। একথা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন রোকেয়া। অযৌক্তিক ধর্মবোধ মহিলাদের মধ্যে কীভাবে কাজ করত তাঁর কয়েকটি লাইন ″অবরোধ বাসিনী″

রচনা থেকে তুলে দিচ্ছি, --

″ আমার দূর সম্পর্কিয়া এক মামী

শাশুড়ি ভাগলপুর হইতে পাটনা

যাইতেছিলেন; সঙ্গে একজন পরিচারিকা ছিল। কিউল স্টেশনে ট্রেন বদল করিতে হয়। মামানি সাহেবা অপর ট্রেনে উঠিবার সময় তাঁহার প্রকান্ড বোরকায় জড়াইয়া ট্রেন ও প্লাটফর্মের মাঝখানে পড়িয়া গেলেন। স্টেশনে মামানি চাকরানী ছাড়া ওপর কোনো স্ত্রী লোক ছিল না। কুলিরা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াই চাকরানী দোহাই দিয়ে নিষেধ করিলো -- খবরদার, কেহ বিবিসাহেবার গায়ে হাত দিয়োনা। সে একা অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই তাহাকে তুলিতে পারিল না। হায়রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ! নিজের মতো করে ধর্মকে ব্যবহার করতে গিয়ে একজন মানুষের প্রাণ চলে গেলো। অথচ ইসলাম শান্তির কথা বলে, বাঁচার কথা বলে ' নিজে বাঁচো অপরকেও বাঁচতে দাও এই বার্তা দেয় '। ″মতিচুর ″ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে যে ″বোরকা ″ নামক প্রবন্ধটি রয়েছে সেখানে বোরকা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন শালীনতা ও সুরুচিকর পোশাকের কথা। বোরকা পরে মহিলারা ঘরে বন্দি হয়ে থাকবে একথা তিনি কখনোই মানতে পারেননি। কারণ তাদেরও একটি বাইরে কাজের জগৎ আছে। তিনি কখনই পর্দাপ্রথার বিরোধী ছিলেন না। পর্দা বা শালীন পোশাক পরেই মহিলাদের কাজের মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহব্বান করেছেন, --

' পর্দা অর্থে তো আমরা বুঝি গোপন হওয়া বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি। কেবল অন্তপুরের চারি প্রাচীরের ভেতর থাকা নহে। এবং ভালো মতো শরীর আবৃত না করাকে - বেপর্দা বলি।... যাহারা ভালো মতো পোশাক পড়িয়া মাঠে বাজারে বাহির হন তাহাদের পর্দা বেশি রক্ষা পায়।'

আসলে সেই সময় মুসলিম সমাজে মেয়েদের অন্ধকার কুপে ফেলে রেখে নিজের মতো করে পরিচালনা করা হত। এই ঘটনাগুলি রোকেয়াকে মর্মাহত করে ছিল। তিনি দুঃখের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বলেন, --

' সকল নিয়মেই একটা সীমা আছে।

এদেশে আমাদের অবরোধ প্রথাটা বেশি কঠোর হইয়া পড়িয়াছে।'

এই প্রসঙ্গে তাঁর ″বলিগর্ত ″ গল্পটি একটি আলোক পাত করা প্রয়োজন।

গল্পের প্রধান চরিত্র খাঁ বাহাদুর খটখটে একজন ধার্মিক মানুষ। তিনি একবার স্বপরিবারে চিকিৎসার জন্য গুপ্তপুরে যান। সেখানে খাঁ বাহাদুর খটখটে কিশোরী ভগিনী ও কতিপয় ভাগিনী আব্দার করলো পুরো শহরটা দেখার জন্য। মেয়েদের শহর ঘোরাটা ধর্মবিরোধী কাজ বলে আপত্তি করলেন খাঁ বাহাদুর। আপত্তি থাকা সত্ত্বেও একটা মোটা কালো কাঁচওয়ালা গাড়িতে করে ওই মেয়েগুলিকে ঘোরালেন। গাড়িতে মহিলারা আবছা আলো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। অথচ খটখটে সাহেব বললেন, --

' দেখো তোমরা মোটরে বেড়াইতে গিয়া অসংখ্য পুরুষের মুখ দেখিয়েছো। সেজন্য এখনই আমার সম্মুখে তওবা (অনুতাপ) করো। এবং প্রতিজ্ঞা করো জীবনে আর মোটরে উঠিতে চাহিবে না।'

আর একটি মজার গল্প বলি--″বলিগর্ত ″রচনা থেকে। শাস্ত্রে সুদ নিষিদ্ধ তাই খটখটে সাহেবে সুদ নিতেন অন্যভাবে, --

' ... ধর্ম বিনিময়ে সুদ লইতে হয়, ধর্ম কি এমন সস্তা যে তাহা অল্পমূল্যে বিক্রয় করা যায়।'

অর্থাৎ ধর্মবিনিময়ে তিনি চড়া সুদ নিতেন।

' কোনো কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারি প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী।'

কবির এই কন্ঠ ঝরা কথা বিশ শতকের প্রথম দিকে পুরুষ সমাজের মানস পটে যখন পাত্তা পাইনি, তখন শুধু মুসলিম সমাজ নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ গঠনের তাগিদে বেদনাহত রোকেয়া রচনা করলেন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ″পদ্মরাগ ″(১৯২৬)। সব ধর্মেই মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ মুসলিম সমাজের অশিক্ষিত পুরুষেরা নারী শিক্ষাকে অমঙ্গল মনে করেছে। তাই মেয়েরা শিক্ষার আঙ্গিনাই আসতে পারবে না। এই সব মর্মান্তিক ঘটনা দেখে রোকেয়া খুব কষ্ট পেতেন। শিক্ষার জন্য বিশেষ করে নারী শিক্ষার জন্য তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ″আঞ্জুমান- ই - খাওয়াতিনে ইসলাম।″ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ″পদ্মরাগ ″ উপন্যাসের তারিণী ভবনের মিল খুঁজে পায়। আসলে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দীন তারিণীর মধ্যে দিয়ে বেগম রোকেয়া নিজের কথাই বলতে চেয়েছেন। একজন মহিলাকে প্রকৃত শিক্ষিতা করে তুলতেই পারলে সে নিজের অধিকার বুঝে নিয়ে পুরুষ সমাজের পাশে দাঁড়াতে পারবে। তাই বেগম তাঁর ″পদ্মরাগ ″ উপন্যাসে তারিণীভবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন, --

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য জীবন : সমকালীন নারী-সমাজ **ফারজিনা পারভীন**

'যে বিধবার তিন কূলে কেহ নাই, সে কোথায় আশ্রয় পাইবে?--তারিণীভবন। যে বালিকার কেহ নাই, সে কোথায় শিক্ষালাভ করিবে?-- তারিণী বিদ্যালয়ে। যে সধবা স্বামীর পাশবিক অত্যাচারে চূর্ণ-বিচূর্ণ, জরাজীর্ণ হইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সে কোথায় গমন করিবে?-- এই তারিণী কর্মালয়ে। যে দরিদ্র দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছে, তাহারাও আশ্রয়স্থলে ঐ তারিণী আতুরাশ্রম।'

পৃথিবীর নানা দেশে যখন নারী জাগরণের জোয়ার আছড়ে পড়ছে তখন তার ঢেউ বেগম রোকেয়ার রচনায় এসে পড়েছে। ভারতবর্ষের মুসলিম নারীসমাজের নীরবতা দেখে তিনি হতবাক। তাই ছাই চাপা আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো বেরিয়ে এল তাঁর সাহিত্য লেখনীতে। পুরুষদের কথা মতো মহিলাদের কাঁটাযুক্ত পথ দিয়ে হাঁটতে হত, পায়ের তলায় কাঁটা বিঁধে রক্তাক্ত হয়ে যেত, দিনের আলোয় ঘুমোতে হত, রাতের বেলা চোখ মেলতে পেতো। এই বর্বরচিত ঘটনা দেখে সমকালীন নারীশক্ষা, নারীমুক্তি ও অশিক্ষিত মানুষের বিরুদ্ধে যেভাবে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, তাঁর সাহিত্যের মধ্যে তা আজও মহিলাদের কাছে পাথেয় হয়ে থাকবে।

জয় গোস্বামীর কবিতা : বিষয়বৈচিত্র্য ও শৈলীগত অনুধ্যান

মোহা মোসারাফ হোসেন

শিল্পসত্বার বহুকৌনিক বিচ্ছুরণ যা পার্থিব সমাজকে সর্বদা দীপ্তিময় করে চলেছে তার অন্যতম শিখর সাহিত্য। সাহিত্যের সুবিধা সার্বিক। একদিকে মনের ভাব প্রকাশের জন্য প্রয়োজন অন্যদিকে নান্দনিক সৌন্দর্যে হৃদয়ের গহিনে চিরঅম্লান। সেই প্রয়োজনবোধ ও সৌন্দর্যবোধের দ্ব্যর্থ তাড়নায় যে ভাষার উদ্ভব, সেই ভাষাকে বাহন করে শিল্পীর অনুভূতির বর্নময় বিভা বিচ্ছুরিত হয় হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে। পৃথিবীর আদি ভাষাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কুলীন ইন্দো-ইউরোপীয়র প্রপৌত্র গোত্রীয় ভাষা বাংলার আবির্ভাব মাত্র হাজার বছর আগে। কোমল বাংলাদেশের পরিবেশে লালিত এই ভাষাটি রত্নগর্ভা। তার কোলে জন্ম নিয়েছে চন্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রের মত মানুষ । একে পৃথিবীর আঙিনায় আলোকোজ্জ্বল ভাবে পরিচয় করিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যজিৎ রায়ের মতো কৃতি বাঙালি সন্তানেরা। এই উর্বরগর্ভা বাংলা জননীর বুকে বেড়ে ওঠা আর এক সঙ্গীতপ্রিয় সাহিত্যসাধক জয় গোস্বামী । বাংলা সাহিত্যের মান ভারত তথা বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিতে তার অকৃপণ আত্ম নিবেদন শোধবার নয়।

কালের কৃপায় কল্লোলিনী কলকাতায় কবি জয় গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন ১০ নভেম্বর, ১৯৫৪ সালে। পিতা স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সঙ্গীত সাধক ধীরানন্দ গোস্বামী, মাতা শিক্ষিকা সবিতা গোস্বামী । কবির জন্ম কলকাতায় হলেও বেড়ে ওঠা নদীয়ার রাণাঘাটে। ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারি গোস্বামী পরিবার রাণাঘাটে চলে আসেন। সেখানেই কবির সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত, শৈশব থেকেই সঙ্গীতের সঙ্গে সীমাহীন সম্পর্ক তৈরি হয় কবির। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত ৬ এপ্রিল ১৯৬৩ সালে মাত্র আট বছর বয়সে কবি পিতৃহারা হন, তবু জীবনের কাছে হার না মেনে ১৩-১৪ বছর বয়স থেকেই শব্দ ও সঙ্গীতের সত্যিকারের সাধক হয়ে ওঠেন। যার পরিপূর্ণতা স্বরূপ ষোলো-সতেরো বছর বয়সে শুরু হয় কাব্য জগতে বল্গাহীন পথ চলা। তবে জীবনের আবর্তনে কাব্য ক্ষেত্রে যেমন জোয়ার দেখা গেল তার বিপরীতে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠের প্রতি এলো ভাটা, একাদশ শ্রেণিতে পাঠ কালেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে হয়ে উঠলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ স্রষ্টা। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশ পেলো কবির প্রথম কাব্য 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেট গুচ্ছ' । এরপর ১৯৭৮ এ দ্বিতীয় কাব্য 'প্রত্নজীব', তৃতীয় কাব্য 'আলেয়া হ্রদ' (১৯৮১)। কবির প্রতিভা যখন উদীয়মান, ১২ মে ১৯৮৪ তে একমাত্র আশ্রয় মা চলে গেলেন না ফেরার দেশে। কবির জীবনে নেমে এল শূন্যতা, সেই সঙ্গে ঘরে হানা দিল অভাববোধ। সেই যন্ত্রণা নিয়ে লিখলেন' উন্মাদের পাঠক্রম' (১৯৮৬), একে একে রচিত হতে লাগল' ভূতুম ভগবান' (১৯৮৮), 'ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা?' (১৯৮৯) ইত্যাদি বিখ্যাত কাব্যগুলি। এরপর ১৯৯২ তে কবি পুনরায় চলে আসেন কলকাতায়। এবার কবির হাত থেকে পাই 'পাগলি, তোমার সঙ্গে' (১৯৯৪), 'পাতার পোশাক' (১৯৯৭), 'শাসকের প্রতি' (২০০৭) ইত্যাদি কালজয়ী সৃষ্টি। ১৯৯৮ তে প্রকাশিত হয় কালোত্তীর্ণ কাব্যোপন্যাস 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল', তাছাড়া গদ্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ছোটোগল্প, ছোটদের জন্য রচনাও তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর কবিতা ও উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ বাংলা সাহিত্যকে কৌলিন্য এনে দিয়েছে। অসুস্থতা কবির দোসর হলেও প্রতিটি বইতে আসে সৃষ্টির নব নব বাঁক, নিজের সীমাকে অতিক্রম করে নতুন সীমা তৈরি করা। তাঁর জীবন ও সৃজন পাঠকের জন্য আনন্দ পাঠশালা।

কবি জয় গোস্বামীর সাহিত্য জগতে প্রবেশের সোপান গোস্বামী পরিবার । পৈতৃকভাবেই শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের একটা আবহ পেয়েছিলেন

কবি। সেই সুপ্ত আকরকে কাজে লাগিয়ে ১৯৬৭ তে বাড়ির সিলিং ফ্যান নিয়ে লিখে ফেলেন জীবনের প্রথম কবিতা। ১৯৭৩ সালে রানাঘাট স্টেশনের দেওয়াল পত্রিকায় কবির প্রথম কবিতা ছাপা হয়। সেই বছরেই তিনটি ছোটো ছোটো পত্রিকায় 'সীমান্ত সাহিত্য', 'পদক্ষেপ' ও 'হোমশিখা' নামের তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এরপর কবিতা রচনা ও প্রকাশ দুইয়ের গতিই আরও ত্বরান্বিত হতে থাকে, ১৯৭৬ সালের মধ্যে দু-আড়াইশো কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ শ্রেণিতে অকৃতকার্য হওয়ার পর থেকেই লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক কবির ক্ষীণ হয়ে আসছিল ঠিকই কিন্তু অন্তরে ক্রম পরিপুষ্ট হচ্ছিল শৈল্পিক মনন। যাইহোক, ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয় কবির প্রথম কাব্য 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেট গুচ্ছ' । সে সময় বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় সীমাহীন জনপ্রিয়তা নিয়ে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলেছেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো রথী মহারথীরা, তখন নতুন করে পাঠকগোষ্ঠী জোগাড় করা দুরূহ ছিল। কিন্তু সে কাজে সফল হয়েছেন জয় গোস্বামী। নিজস্ব সৃষ্টির মহিমায় পাঠকদের মোহিত করে। ফলে জয় গোস্বামীর উন্মেষ ও প্রতিষ্ঠা সাতের দশক বলতে পারি। কবিতা চর্চার সঙ্গে সমানতালে চলে কবিতার গঠন নিয়ে নানান পরীক্ষা । এই দশকেই কবি নতুন আঙ্গিকে আমাদের উপহার দেন তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'প্রত্নজীব' (১৯৭৮)। আটের দশক বিশেষত রানাঘাট পর্ব অর্থাৎ কলকাতা যাওয়ার আগে পর্যন্ত কবি উন্মেষের সীমা ছাড়িয়ে পাকা আসন নিয়ে নেন বাংলা কাব্যাকাশে। ১৯৮১ তে প্রকাশিত হয় তৃতীয় কাব্য 'আলেয়া হ্রদ', ১৯৮৬ তে 'উন্মাদের পাঠক্রম', ১৯৮৮ তে 'ভূতুম ভগবান' আর 'ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা? '(১৯৮৯) প্রকাশের পর কবি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এভাবে প্রতিনিয়ত নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে জয় গোস্বামী হয়ে উঠেন বাংলা সাহিত্যে জগতের বনস্পতি।

প্রেম মানব জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি । পার্থিব জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে প্রেম। তবে সকল মানুষের মধ্যে প্রেমের আকর থাকলেও তাদের প্রেমগত দর্শন ও প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন ঘরানার। প্রসঙ্গত, জয় গোস্বামীর একজন প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের মধ্যে প্রেম মনোস্তত্ত্বের এক অনন্য রূপকার স্বয়ং জয় গোস্বামী। তাঁর প্রেমের আশ্চর্যশক্তি, সে জন্মান্ধ মেয়েকে জ্যোৎস্নার ধারনা দিতে চাই–

'জন্মান্ধ মেয়েকে আমি জ্যোৎস্নার ধারনা দেব বলে,
এখনও রাত্রির এই মরুভূমি জাগিয়ে রেখেছি।'

নিজস্ব প্রেমের প্রতি অগাধ প্রত্যয় না থাকলে এমন বাণী আসতে পারে না। 'ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা? ' কাব্যের 'স্নান' একটি অসাধারণ প্রেম প্রস্তাবের কবিতা। কবি প্রেমিকাকে বলেছেন –

'যদি বলি
আমি সে পুরুষ
দ্যাখো, যার জন্য তুমি এতকাল
অক্ষত রেখেছ, ওই রোমাঞ্চিত যমুনা তোমার। '

দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর এই স্পষ্ট প্রেমবার্তা খুবই মনোরম। তবে শুধু মিলন নয়, প্রেমের বিচ্ছেদ ও স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকার বেদনা বর্ণিত হয়েছে খুবই জনপ্রিয় কবিতা 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয় 'এ। বেনীমাধবের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে প্রেমিকা এখন সেলাই দিদিমণি। তবে 'প্রাক্তন' কবিতায় আবার ছেড়ে যাওয়া স্বামীর প্রতি বিচ্ছেদের পর টানের বিবরণ আছে –

'ঠিক সময়ে অফিসে যায়?
ঠিক মত খায় সকালবেলা?'

কিংবা যন্ত্রণার স্মৃতি হৃদয় নিংড়ে বলে ওঠে –

' কার গায়ে হাত তোলে এখন?'
[পাগলী তোমার সঙ্গে]

জয় গোস্বামীর প্রেম কখনও আবার চূড়ান্ত সামাজিক।

দাম্পত্য প্রেমের প্রতি কবির চূড়ান্ত আকাঙ্খা। যদিও এই জীবনে শতত ঝামেলা আছে। তবু পাগলীর সঙ্গে বহুবিধ জীবন কাটানোর ইচ্ছা পোষন করেন কবি–

'পাগলী, তোমার সঙ্গে ভয়াবহ জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে ধুলোবালি কাটাব জীবন'
....
'সন্ধ্যাবেলা ঝগড়া হবে, হবে দুই বিছানা আলাদা
হপ্তা হপ্তা কথা বন্ধ মধ্যরাতে আচমকা মিলন,'
[পাঁচালী : দাম্পত্য কথা]

শত বিচ্ছেদ সত্ত্বেও প্রতিক্ষেত্রে জীবনরস উপভোগের কামনায় জয় গোস্বামীর প্রেম ভাবনা অভিনব।

চেতনাবোধই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে উন্নত ও আলাদা করেছে। আর সমগ্র চেতনার মধ্যে সময় চেতনা সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞার পরিচয়বাহী । যেহেতু সময়ের কোলে আমরা লালিত তাই সময় বা কাল কবিকে বাধ্য করবে কলম ধরতে, এই অনুভূতির তারতম্যের জন্যই 'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি' সেই দায়বদ্ধতার জন্যই হয়তো নন্দীগ্রামে ১৪ জন নিহতের প্রেক্ষিতে কবি লিখলেন –

'আপনি যা বলবেন আমি ঠিক
তাই করব, তা-ই খাব, তা-ই পরবো,
.....
বলবেন, গলায় দড়ি দিয়ে
ঝুলে থাকো সারারাত। তা-ই থাকবো। -শুধু
পরদিন যখন বলবেন
এইবার নেমে পড়ো
তখন কিন্তু লোক লাগবে আমাকে নামাতে
একা একা নামতে পারবো না
ওটুকু পারিনি বলে অপরাধ নেবেন না যেন।'
[শাসকের প্রতি :জয় গোস্বামী]

আলোচ্য কবিতায় সময় চেতনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা দুইই শরীর লাভ করেছে। তাছাড়া ' অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান' কবিতাতেও কবি অস্ত্র ফেলে গানের কাছে আত্মসমর্পণের কথা স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন।

এই বুড়ো বসুন্ধরা, ধরাব্যাপী গোষ্ঠীতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্রের মতো অনেক তন্ত্রেরই জন্ম দিয়েছে, কিন্তু কোনো তন্ত্রেই মানুষের অর্থনৈতিক ভারসাম্য আশানুযায়ী স্থিতি লাভ করেনি। সমস্ত তন্ত্রেই কম বেশি একটি শ্রেণি শাসক, একটি শোষিত, একটি উৎপাদক একটি ভক্ষক। আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটেও লক্ষিত হয় যে, সীমিত মানুষের হাতেই অধিকাংশ অর্থ সঞ্চিত, বাকিরা বঞ্চিত। ফলে সিংহভাগ মানুষই অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার যে অর্থনীতি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যারা নিম্নবিত্ত, যাদের জীবনের মৌলিক দাবি পূরণ হয় না, তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবী কেমন? পূর্ণিমার চাঁদ কি প্রিয়ার উপমা না ঝলসানো রুটি? এই মৌলিক জীবন জিজ্ঞাসা জয় গোস্বামীর কবিতাতে দরদের সঙ্গে পরিস্ফুটিত। আর যারা নিম্নমধ্যবিত্ত তাদের জীবনে আছে শংসয়, দোলাচলতা, তাদের অর্থ 'থাকলে রাজার হাল, না থাকলে হরি বল' অবস্থা। জীবনের এই ব্যাকরণহীনতা 'ভূতুম ভগবান' কাব্যের 'নুন' কবিতায় সার্থকভাবে চিত্রিত–

'সবদিন হয় না বাজার, হলে হয় মাত্রাছাড়া
বাড়িতে ফেরার পথে কিনে আনি গোলাপচারা
.....
মাঝে মাঝে চলেও না দিন, বাড়ি ফিরি দুপুর রাতে
খেতে বসে রাগ চড়ে যায়, নুন নেই ঠান্ডা ভাতে'

এইভাবে মধ্যবিত্ত জীবনের বৈপরীত্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন কবি।

কোনো ইন্দ্রিয়াতীত সত্য এবং ব্যঞ্জনাবহুল ভাবকে মূর্ত ও স্পষ্ট ধারণা দিতে প্রতীক ও আর্কিটাইপের প্রয়োগ করা হয়, এক্ষেত্রে সাহিত্যিকের শিল্পগত ধারণা উচ্চাঙ্গের না হলে সফলতা আসে না। কবি জয় গোস্বামীর প্রতীক ও আর্কিটাইপ ব্যবহারের দক্ষতা তর্কাতীত । তাঁর কবিতায় আগুন, পাখি, ডানা, লতা, সাপ, নদী, শকুন, গান, চিতা, রাত্রি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি শব্দের ব্যঞ্জনাঘন ব্যবহার সহজেই

চোখে পড়ে। এইসব প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করে তিনি পাঠককে এক বিশেষ সত্যে পৌঁছে দেন। কবি জীবনানন্দের মতো তিনিও শব্দ ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ। নিজস্ব নির্মাণশৈলীর গুনে তিনি কিছু শব্দবন্ধ তৈরি করেছেন, যেমন – প্রত্নজীব, অক্ষিরস, মেয়েসাপ, সোনামাছ, মোহঋতু, স্নেহদাগ, রক্তমেঘ, শ্মশানবন্ধু ইত্যাদি। এসব শব্দের মাধ্যমে পাঠককে একটি বিশেষ ভাবগত আবহ উপহার দিতে কবি সক্ষম হয়েছেন। তাই প্রতীক ও আর্কিটাইপের নন্দন সৃষ্টিতে জয় গোস্বামীর জুড়ি মেলা ভার।

প্রতিভা মূল্যাতীত একথা স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত সত্য। তবু সামাজিক সম্মান ও পুরস্কারের মাধ্যমে আমরা একটা ছায়ামূল্য দিতে সচেষ্ট হই। এক্ষেত্রে প্রথমাংশে কবি অজেয়, বাঙালি পাঠকের হৃদয়ে তাঁর সোনার আসন পাকা। দ্বিতীয়ত, 'ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা?' (১৯৮৯) কাব্যের জন্য তিনি ১৯৯০ সালে আনন্দ পুরস্কারের অধিকারী হন, ১৯৯৭ সালে 'বজ্রবিদ্যুৎ ভর্তি খাতা' (১৯৯৫) কাব্যের জন্য পান পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাদেমি পুরস্কার, ওই বছরই 'পাতার পোশাক' (১৯৯৭) কাব্যের জন্য স্বীকৃত হন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কারে। পরের বছর 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল (১৯৯৮) কাব্যোপন্যাসের জন্য পুনরায় আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০০০ সালে 'পাগলী তোমার সঙ্গে '(১৯৯৪) কাব্যের জন্য কবিকে সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার দান করা হয়। তাছাড়া ২০০১ সালে আমেরিকার লেখক শিবিরে যাত্রা, ২০১১ সালের ভারতীয় ভাষা পরিষদ কর্তৃক রচনা সমগ্র পুরস্কার লাভ। ২০১২ সালে বঙ্গবিভূষণ কবির সম্মান বৃদ্ধি করে। কবি ২০১৫ সালে কলকাতা ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২০১৭ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট সম্মানের অধিকারী হন। এই সম্মান ও পুরস্কার তাঁর প্রতিভার ঋণের প্রতিদানে কতটা সমর্থ তা পাঠকের বিচারাধীন। তবে আজও বাংলা সাহিত্য তাঁর কলমের দিকে চেয়ে আছে নব নব সম্ভারে সমৃদ্ধ হবার প্রত্যাশায় তা অস্বীকার করার জো নেই।

গ্রন্থপঞ্জি –

ক) আকর গ্রন্থ :

১) কবিতা সংগ্রহ–জয় গোস্বামী–আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২) কবিতা সংগ্রহ–২–জয় গোস্বামী–আনন্দ পাবলিশার্স–কলকাতা।

৩) কবিতা সংগ্রহ–৩–জয় গোস্বামী–আনন্দ পাবলিশার্স–কলকাতা।

৪) কবিতা সংগ্রহ–৪–জয় গোস্বামী–আনন্দ পাবলিশার্স–কলকাতা।

৫) কবিতা সংগ্রহ–৫–জয় গোস্বামী–আনন্দ পাবলিশার্স–কলকাতা।

খ) সহায়ক গ্রন্থ :

১) জয় গোস্বামী : বৈচিত্র্যের বিস্তারে–বুকফার্ম।[সম্পাদক:শুভাশিষ চক্রবর্তী ও জিৎ মুখোপাধ্যায়]

২) আধুনিক বাংলা কবিতার নিবিড় পাঠ : শীতল চৌধুরী।প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা।

৩) আধুনিক বাংলা কবিতা:শৈলীগত নানা মাত্রা– ড. দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।পরম্পরা।

৪) কবিতার ঘর ও বাহির:পূর্ণেন্দু পত্রী। দে' জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৫) একালের কবিতা সমীক্ষা:সম্পাদনা–দেবব্রত বিশ্বাস।ব্যঞ্জনবর্ণ।

৬) কবিতার কালান্তর:সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।দে' জ পাবলিশিং, কলকাতা।

গ) সহায়ক পত্র পত্রিকা:

১) কোরক : শারদীয় –২০১৫।(দুই বাংলার কবি ও কবিতা)

২) জিজ্ঞাসা : ২০১৫–২০১৬।(উত্তরঔপনিবেশিক বাংলা কবিতা : বিবিধ দৃষ্টিকোণ)

৩) রৌদ্রছায়া : প্রথম বর্ষ–প্রথম সংখ্যা, ২০১৫–২০১৬।(সম্পাদক–বিকাশ রায়)

_____

অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ছোবলে রক্তাক্ত হচ্ছে নতুন প্রজন্ম

মহম্মদ মফিজুল ইসলাম

যন্ত্র সভ্যতা মানুষের জীবনকে যত সহজ করেছে, ততটাই জটিল করে তুলেছে তার মনের ভেতরের জগৎকে। আজকের পৃথিবী প্রযুক্তির হাত ধরে অগণিত সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনার ছায়াতেই জন্ম নিয়েছে এক নীরব বিপর্যয়। সেই বিপর্যয়ের নাম–'অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ছোবল'।

এই ছোবলে আজ রক্তাক্ত হয়ে পড়ছে আমাদের নতুন প্রজন্ম– মানসিকভাবে, সামাজিকভাবে, এমনকি নৈতিকভাবেও।

শিশুর হাতে খেলনা নয়, এখন ফোন। স্কুলের পড়ার টেবিলে বই নয়, ইউটিউব। পরিবারের আড্ডা ভাঙছে পর্দার নীল আলোয়। সারাদিনে যত কথা মেসেজে হয়, মুখোমুখি ততটি কথাও হয় না। এটা শুধু আচরণগত পরিবর্তন নয়, এক গভীর সামাজিক ও মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, ডিজিটাল স্ক্রিনে দীর্ঘ সময় কাটানোর ফলে তরুণদের মস্তিষ্কে 'ডোপামিন' নির্ভর এক অস্বাস্থ্যকর আনন্দচক্র তৈরি হচ্ছে, যা নেশার চেয়েও শক্তিশালী। এই নেশা ধীরে ধীরে তাদের বাস্তব জীবন থেকে ছিন্ন করে দিচ্ছে।

অতীতে কখনও ছিল মাঠের খেলা, প্রতিবেশীর সঙ্গে হাসি-মজা, বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে গল্প করার আনন্দ। এখন সেই সব স্মৃতি কেবল পুরনো ছবিতে। নতুন প্রজন্মের অবসর মানে– স্ক্রিনের দিকে নীরব চেয়ে থাকা, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, আর এক ক্লিক দূরে ভার্চুয়াল সুখের ফাঁদে ধরা পড়া।
ফোন হাতে নেওয়া মানেই যেন পৃথিবীকে ভুলে যাওয়া। বাবা-মা পাশে বসে আছেন, কিন্তু সন্তান তাদের দিকে তাকায় না। তাদের চোখের দৃষ্টি পর্দায়, মন অন্য জগতে। ফলে এক অদৃশ্য প্রাচীর তৈরি হচ্ছে পরিবারে। মায়ের স্নেহ, বাবার উপদেশ, ভাইবোনের সঙ্গ– সব কিছুই যেন হারিয়ে যাচ্ছে ভার্চুয়াল কোলাহলের শব্দে।

বিশেষজ্ঞদের ভাষায়, অতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহারে মস্তিষ্কে যে 'ডোপামিন?' ক্ষরণ হয়, তা মানুষকে স্বল্পসময়ের আনন্দে অভ্যস্ত করে তোলে। ফলে বাস্তব জীবনের ধৈর্য, মনোযোগ, সহানুভূতি– এসব গুণ দ্রুত ক্ষয় হতে থাকে। আমাদের তরুণরা আজ “তাৎক্ষণিক তৃপ্তি” -র দাসে পরিণত হচ্ছে। তারা চায় সবকিছু এক ক্লিকে পেয়ে যেতে। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা এত সহজ নয়। তাই যখন বাস্তব চাহিদা পূরণ হয় না, তখন আসে হতাশা, উদ্বেগ, রাগ, এমনকি আত্মঘাতী প্রবণতা পর্যন্ত।

সম্প্রতি একাধিক সমীক্ষা বলছে, ভার্চুয়াল আসক্তি এখন কিশোর-তরুণদের মধ্যে অন্যতম বড় মানসিক সমস্যার উৎস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও স্বীকার করেছে– "Digital Addiction" আজ মানসিক অসুস্থতার এক নতুন সংজ্ঞা। কিশোরদের ঘুমের ব্যাঘাত, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, একাকিত্বের বৃদ্ধি, এবং আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া– সবই এই আসক্তিরই ফল।

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক বা রিলের ভিড়ে তারা নিজেদের পরিচয় হারিয়ে ফেলছে। অন্যের সাজানো জীবনের ছবির সঙ্গে নিজের জীবন তুলনা করে তারা নিজের মধ্যেই তৈরি করছে হীনমন্যতা। একধরনের আত্মবিরাগ, অনিরাপত্তা, আর ভয় তাদের ঘিরে ফেলছে প্রতিদিন।

শুধু মানসিক নয়, সামাজিক সম্পর্কের উপরেও এর আঘাত প্রবল। পরিবারের ভিত নড়ে যাচ্ছে। মা-বাবা সন্তানের সঙ্গে কথা বলেন না, কারণ সন্তানের মন অন্যত্র। সন্তানরা মনে করে বাবা-মা পুরোনো ধাঁচের মানুষ, যারা “ডিজিটাল বাস্তবতা” বোঝেন না। ফলে সংলাপ হারিয়ে যাচ্ছে পরিবারে।

দাম্পত্য সম্পর্কেও দেখা দিচ্ছে বিচ্ছিন্নতা। পরস্পরের সঙ্গে কাটানোর সময় কমে যাচ্ছে, অথচ ভার্চুয়াল সম্পর্কের সংখ্যা বাড়ছে। এক অদ্ভুত বিভ্রমে মানুষ ভাবছে, সে সংযুক্ত; অথচ বাস্তবে সে একাকী।

এই প্রযুক্তিনির্ভরতা যে কেবল তরুণদের সীমাবদ্ধ রাখছে তা নয়– তাদের ভাবনাচিন্তা, মূল্যবোধ, এমনকি আত্মপরিচয় পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিচ্ছে। তারা আজ নিজেরাই ঠিক জানে না, বাস্তব জগতে তাদের অবস্থান কোথায়। “রিয়েল” আর “ভার্চুয়াল” – এই দুই জগতের সীমারেখা মুছে গেছে।
স্ক্রিনের আলোয় তাদের চেহারা উজ্জ্বল, কিন্তু চোখের ভেতরে অন্ধকার। মনোবিশ্লেষকরা বলছেন, এই প্রজন্মের অনেকেই “ডিজিটাল ডিপ্রেশন” -এর শিকার। তারা ভাবছে, নিজেরাই ব্যর্থ, কারণ অন্যদের পোস্ট করা জীবনের মতো তাদের জীবন আকর্ষণীয় নয়। অথচ সেই পোস্টগুলির বেশিরভাগই সাজানো, সম্পাদিত, অর্ধসত্য।

এখন প্রশ্ন– এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি কীভাবে?
শুধু নিন্দা নয়, প্রয়োজন সচেতনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। প্রযুক্তি শত্রু নয়, কিন্তু তার ভুল ব্যবহারই আমাদের শত্রু হয়ে উঠছে। তাই পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ– সবাইকে মিলে এই অচিন আগুনের ছোবল থেকে বাঁচাতে হবে নতুন প্রজন্মকে।

অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ছোবলে রক্তাক্ত হচ্ছে নতুন প্রজন্ম **মহম্মদ মফিজুল ইসলাম**

অভিভাবককে প্রথমেই বুঝতে হবে– সন্তান কী করছে, কী দেখছে, কতক্ষণ ফোনে সময় দিচ্ছে। একেবারে ফোন কেড়ে নেওয়া নয়, বরং ভারসাম্য শেখানো জরুরি। সন্তানকে সময় দিতে হবে– মন দিয়ে, কথা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে। কারণ, যেখানেই ভালোবাসার ঘাটতি, সেখানেই আসে ভার্চুয়াল আসক্তি।

বিদ্যালয়েও দরকার ডিজিটাল নৈতিকতা শেখানো। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একটি নতুন পাঠ থাকা উচিত– "স্ক্রিন ব্যবহারের শালীনতা"। শিশুদের শেখাতে হবে, প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু তাতে নিজেকে হারাতে নেই।

সরকারি পর্যায়ে, বিশেষজ্ঞদের মতে, স্কুল-কলেজে “Digital Well-being Education” অন্তর্ভুক্ত করা এখন সময়ের দাবি। আর সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে– পাড়ার ক্লাব, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, খেলাধুলা, বইপাঠের সভা– এসবকে আবার প্রাণ ফিরিয়ে দিতে হবে। কারণ জীবনের আসল আনন্দ স্ক্রিনে নয়, সম্পর্কের ভেতরে।

আমরা ভুলে যাচ্ছি, মানুষ এক সামাজিক প্রাণী। তার বিকাশ ঘটে মানুষের সংস্পর্শে, যন্ত্রের সংস্পর্শে নয়।
এই অ্যান্ড্রয়েডের যুগে যখন মানবিক সংবেদনশীলতা ধীরে ধীরে ক্ষয় হচ্ছে, তখন প্রয়োজন এক নতুন “ডিজিটাল মানবতা” র বোধ– যেখানে প্রযুক্তি থাকবে মানুষের সেবায়, মানুষ নয় প্রযুক্তির দাসত্বে।
অ্যান্ড্রয়েড ফোনের এই ছোবল যদি আমরা এখনই ঠেকাতে না পারি, তবে অচিরেই আমরা এমন এক প্রজন্ম পাব, যারা দেখতে জানে কিন্তু অনুভব করতে জানে না। শুনতে জানে কিন্তু সহানুভূতি বোঝে না। কথা বলে, কিন্তু সংলাপ হারিয়ে ফেলে।

তাই এখনই প্রয়োজন আত্মসমালোচনার। আমরা কি নিজেরাও সেই পর্দার বন্দি নই? সন্তানকে ফোন থেকে দূরে রাখতে চাই, অথচ নিজের চোখও সেই পর্দায় আটকে থাকে। সমাজ তখনই বদলাবে, যখন আমরা নিজেদের বদলাতে পারব। শিশুর হাতে ফোনের বদলে বই দিন, গেম অ্যাপের বদলে খেলাধুলার মাঠে পাঠান, “লাইক” -এর বদলে দিন “ভালোবাসা” – তাহলেই একদিন অ্যান্ড্রয়েডের ছোবল হারাবে বিষ, আর ফিরে আসবে মানবতার রক্তিম উষ্ণতা।

এই পৃথিবী প্রযুক্তির নয়, মানুষের হাতে টিকে থাকবে।
তাই এখনই সময়– পর্দার আলো নিভিয়ে মানুষের মুখে তাকানোর, সন্তানের চোখে চোখ রাখার, আবারও একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর।
কারণ, অ্যান্ড্রয়েড ফোন নয়, মানুষই মানুষকে বাঁচাতে পারে।